

ইমাম আবু হানীফা রুমাতুল্লাহি ও

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে নিবেদিত তাঁর

কসীদায়ে নু'মান

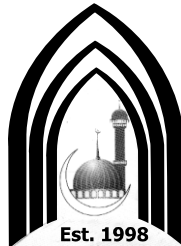
[আরবী-বাংলা]

মূল

ইমাম আযম আবু হানীফা নুমান ইবনে সাবিত রুমাতুল্লাহি



অনুবাদ ও বিশ্লেষণ


মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

ইমাম আবু হানীফা  ও মহানবী -এর শানে নিবেদিত তাঁর কসীদায়ে নু'মান

মূল: ইমাম আযম আবু হানীফা নুমান ইবনে সাবিত 

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে


মুহাম্মদ আবদুল আজিজ আল-আমান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: রবিউল আওউয়াল ১৪৩৬ হি. = জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১১৪, বিষয় ক্রমিক: ০৪

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

শব্দবিন্যাস: 

সি/২০৪, পেপার প্লাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেন্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ৬০ [ষাট] টাকা মাত্র

Qasida-e-Nu'man: By: Imam Azam Abu Haneefa Numan Ibn-a-Sabit (Rh.), Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 60

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saaibd.org

সূচিপত্র

| | |
|---|----|
| লেখক পরিচিতি | ০৪ |
| জীবন ও কর্ম | ০৪ |
| জন্ম ও বংশ | ০৪ |
| প্রিয় নবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎবাণী | ০৬ |
| শিক্ষা ও অধ্যাপনা | ০৭ |
| ছাত্রবৃন্দ | ০৯ |
| ইমাম আযম <small>রাহিমুল্লাহ</small> -এর বুদ্ধিমত্তা | ১০ |
| স্বভাব-চরিত্র | ১৩ |
| ইবাদত ও রিয়াযত | ১৬ |
| রচনাবলি | ১৭ |
| ইমাম আযম <small>রাহিমুল্লাহ</small> ও ইলমে ফিকহ | ১৮ |
| হানাফী মাযহাব দেশে দেশে | ২৫ |
| নবীপ্রেম ও ইমাম আবু হানীফা <small>রাহিমুল্লাহ</small> | ২৬ |
| ইমাম আবু হানীফা <small>রাহিমুল্লাহ</small> -এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলি | ২৭ |
| ওফাত | ২৮ |
| কাসীদা | ৩০ |
| গ্রন্থপঞ্জি | ৩৮ |

লেখক পরিচিতি

জীবন ও কর্ম

ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি বিশ্বের এক অবিস্মরণীয় ও সম্মানিত নাম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদদের ইমাম, বিজ্ঞ হাদীসবেত্তাদের সম্মানিত উস্তাদ ও সূফীয়ায়ে কেরামের পথপ্রদর্শক। বস্তুত নুবুয়ত ও সাহাবিয়াতের মহান মর্যাদাদ্বয়ের পর একজন মানুষের মধ্যে যতো প্রকার মহৎ গুণাবলি হতে পারে তিনি সেই সবার প্রকৃত ধারক ও বাহক ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি ইসলামী ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে যেসব মৌলিক নীতিমালা (উসূল) প্রণয়ন করেছেন তা উম্মতে মুহাম্মদীর বেশি সংখ্যক লোক মেনে নিয়েছেন। আর ফিকহী হানাফীর অনুসারী (মুকাল্লিদ) হওয়াকে নিজেদের জন্য গৌরব মনে করেন। অগণিত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও সূফী-দরবেশ তাঁর মাযহাবের অনুসারী। অনেক মুহাদ্দিস ও দার্শনিক তাঁর উসূল (নীতিমালা)-এর ভিত্তিতে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে দুই তৃতীয়াংশের বেশি মুসলমান ফিকহী হানাফী মোতাবেক নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক ও ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত।

জন্ম ও বংশ

ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর বংশ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত আল-খতীবুল বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.) রহমতুল্লাহু আলায়হি তাঁর সম্পর্কিত সকল বর্ণনা একত্রিত করেন আর বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত অপবাদ খণ্ডন করার প্রয়াস পান। অনেক ইতিহাসবিদদের ধারণা যে, ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর দাদা ‘যূতী’ গোলাম ছিলেন। অথচ খতীবে বাগদাদী ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর প্রৌপিত্র ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর দাদা ‘যূতী’ আদৌ গোলাম ছিলেন না। তিনি তাঁর বর্ণনায় এটা

বিশেষভাবে বলেছেন যে, ‘আমরা গোলাম নই এবং কখনো গোলাম ছিলাম না।’^১ খতীব বাগাদাদী মোহাম্মদ আলিয়াহি-এর এসব বর্ণনা পরবর্তী গবেষকরা মেনে নিয়েছেন।^২

‘যুতী’ সম্পর্কে এটা সঠিকভাবে জানা যায়নি যে, তিনি কোন শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তবে এটা বলা যায় যে, তিনি পারস্য অঞ্চলের কোন এক শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এ যুগে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব পড়লে অনেক সম্ভ্রান্ত গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর গোত্রের সমস্ত লোক তাঁর বিরোধী হয়ে উঠলে তিনি পারস্য ত্যাগ করে কুফায় হিজরত করেন। এ সময় কুফা ছিলো ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং হযরত আলী মোহাম্মদ আলি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলীফা। একদিন ‘যুতী’ আমীরুল মুমিনীনের খিদমতে মুহাব্বতের নিদর্শনস্বরূপ ফালুদা নিয়ে উপস্থিত হন, যা খলীফা বেশ পছন্দ করতেন। ইমাম সাহেবের পিতা ‘সাবিত’ মোহাম্মদ আলিয়াহি কুফায় জন্মগ্রহণ করলে, ‘যুতী’ শিশুকে হযরত আলী মোহাম্মদ আলি-এর খিদমতে নিয়ে যান। তিনি সল্লেহে শিশু ও তাঁর বংশের কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত এই গোত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।^৩

ইমাম আযম মোহাম্মদ আলিয়াহি-এর জন্ম তারিখ নিয়ে কয়েকটি মত দেখা যায়। যথা- ৬০ হি. = ৬৭৯ খ্রি., ৬১ হি. = ৬৮০ খ্রি., ৭০ হি. = ৬৮৯ খ্রি.। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৮০ হিজরী ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (২৬-৮৬ হি. = ৬৪৬-৭০৫ খ্রি.)-এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে আল্লামা মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাওসারী (১২৯২-১৩৭১ হি. = ১৮৭৯-১৯৫২ খ্রি.) বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর জন্মতারিখ ৭০ হি. = ৬৮৯ খ্রি. সালকে প্রাধান্য দেন।^৪

ইমাম আযম মোহাম্মদ আলিয়াহি-এর প্রকৃত নাম ‘নুমান’ আর কুনিয়াত (উপনাম) আবু হানীফা। আবু হানীফা মোহাম্মদ আলিয়াহি-এর অর্থ হলো সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতবাদ থেকে বিমুখ হয়ে সঠিক দীন বা ধর্ম গ্রহণকারী সেই অর্থে এ কুনিয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর নুমান নামের রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-মক্কী আল-হায়তামী মোহাম্মদ আলিয়াহি (৯০৯-৯৭৪ হি. = ১৫০৪-১৫৬৭ খ্রি.) বলেন, নুমান অভিধানে ওই রক্তকে বলে যা দ্বারা শরীরের সমস্ত পাঁজর অটুট থাকে এবং যা দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গ সতেজ থাকে। আর তেমনি ইমাম আযম মোহাম্মদ আলিয়াহি-এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব ইসলামের মেরুদণ্ড এবং

^১ খতীব বাগাদাদী, *তারীখু বগাদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৬, জীবনী : ৭২৪৯

^২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪৪৯, জীবনী : ৮১৭

^৩ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪৪৯, জীবনী : ৮১৭

^৪ সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, খ. ২, পৃ. ১৭২

ইবাদত ও মুআমিলাত (সামাজিক রীতি-নীতি)-এর সমস্ত বিধি-বিধানের জন্য আত্মাস্বরূপ। ‘নুমান’-এর দ্বিতীয় অর্থ হলো, লাল ও সুগন্ধময় ঘাস। যেহেতু তাঁর সূচিক্তিত ইজতিহাদ ও গবেষণায় ফিকহে ইসলামী (ইসলামী আইনশাস্ত্র) বিশ্বের চতুর্দিকে সুগন্ধির মতো ছড়িয়ে পড়ে।^১

প্রিয় নবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎবাণী

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর জন্মের বহু বছর পূর্বে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে হযুর লায়াযিকুমু সালাম-এর সুসংবাদ পাওয়া যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ
الْجُمُعَةِ: ﴿وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۖ﴾ [الجمعة] قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ
مِنْ هَؤُلَاءِ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়ারাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমরা হযুর লায়াযিকুমু সালাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এ সময় সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হলো। যখন হযুর লায়াযিকুমু সালাম ‘তাঁদের অন্যান্য জনও যাঁরা এখনও তাঁদের সাথে মিলিত হয়নি’ [সূরা আল-জুমুআ ৬২:৩] আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন, তখন উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, হযুর! এ অন্যান্যরা কারা, যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয়নি? হযুর লায়াযিকুমু সালাম উত্তরদানে নিরবতা পালন করলেন। যখন বারবার এ প্রশ্ন করা হয় তখন হযুর লায়াযিকুমু সালাম হযরত সালমান ফারসী রাযিয়ারাহু আনহু-এর কাঁধে তাঁর পবিত্র হাত মুবারক রেখে ইরশাদ করলেন, ‘যদি ঈমান (দীন) সুরাইরা নক্ষত্রের নিকটেও অবিস্থত হয় তবে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তা অবশ্যই হস্তগত করে নেবে।’^২

আল্লামা ইবনে হাজার আল-মক্কী আল-হায়তামী রহমতুল্লাহু আলায়হ হাফিযুল হাদীস ইমাম জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আস-সুযুতী রাযিয়ারাহু আলায়হ (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.)-এর ছাত্রদের বরাতে লিখেছেন যে, আমাদের উস্তাদ (সুযুতী) দৃঢ়তার সাথে বলতেন যে, এ হাদীস দ্বারা ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর যুগে

^১ ইবনে হাজার আল-হায়তামী, আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৪৮

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ১৫১, হাদীস: ৪৮৯৭

তিনি প্রথমে ইলমে কালাম তথা আকায়িদ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। এ শাস্ত্রে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অর্জনের পর আল্লাহদ্রোহী ইসলামবিদ্বেষী তাগুতি অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের অপতৎপরতা কঠোরভাবে দমন করেন এবং ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল পতাকাকে সমুন্নত করেন। কিছুকাল পর তাঁর অন্তরে এ ধারণার উদ্বেক হলো যে, দীন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ থেকে অধিক জ্ঞানী কে হতে পারে? তা সত্ত্বেও এ পুত-পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিগণ জবরিয়া, কদরিয়া প্রভৃতি বাতিল দল-উপদলের দোদাঁড় প্রতাপের প্রাক্কালে শুধু তাঁদের বিরোধিতায় দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তাদের চিন্তাধারায় বেশিরভাগ কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের মাসায়িলের দিকে ছিল সবচেয়ে বেশি। এরপর থেকেই ইমাম আযম রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এসব বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইলমে ফিকহের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন কুফার খ্যাতনামা ফকীহ ও ইসলামী আইনবিদ হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (০০০-১২০ হি. = ০০০-৭৩৭ খ্রি.)-এর শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়মিত যোগদান করেন।^১

গবেষকগণ ইমাম আযম রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ-এর উস্তাদদের মধ্যে প্রসঙ্গি ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের এক দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজর আল-মক্কী আল-হায়তামী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর *আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আন-নুমান* গ্রন্থে আবু আবদুল্লাহ ইবনে হাফসের সূত্রে তাঁর চার হাজার উস্তাদের নাম উল্লেখ করেন।^২

মূলত ইমাম আযম রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন একজন তাবিঈ।^৩

ইবনে সাদ রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (১৬৮-২৩০ হি. = ৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.) তাঁকে তাবিঈদের পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক ইবনুন নাযর আল-আনসারী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (১০ হি. পূর্ব-৯৩ হি. = ৬১২-৭১২ খ্রি.)-কে দেখেছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আলকমা ইবনে খালিদ আল-আসলমী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (০০০-৮৭ হি. = ০০০-৭০৬ খ্রি.), হযরত সাহল ইবনে সাদ আল-আনসারী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (০০০-৯১ হি. = ০০০-৭১০ খ্রি.) ও হযরত আবুত তুফায়েল আমির ইবনে ওয়াসিলা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-কুরায়শী রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (০৩- ১০০ হি. = ৬২৫-৭১৮ খ্রি.) প্রমুখ সাহাবীদের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন।^৪

^১ ইবনে হাজর আল-হায়তামী, *আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আন-নুমান*, পৃ. ৫৯০

^২ ইবনে হাজর আল-হায়তামী, *আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আন-নুমান*, পৃ. ৫৯০

^৩ ইবনুন নদীম, *আল-ফিহরুস্ত*, পৃ. ১০১

^৪ সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর উস্তাদদের তালিকায় সাতজন সাহাবী ও আহলে বায়ত এবং ৯৩ জন প্রসঙ্গি তাবেঈ রয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক আল-আনসারী রহমতুল্লাহু আলাইহ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফা আল-আসলমী রহমতুল্লাহু আলাইহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাবেঈদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: হযরত যায়দ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রহমতুল্লাহু আলাইহ (৭৯-১২২ হি. = ৬৯৮-৭৪০ খ্রি.), হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে যয়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী আল-বাকির রহমতুল্লাহু আলাইহ (৫৮-১১৪ হি. = ৬৭৬-৭৩২ খ্রি.), হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-বাকির আলী ইবনে যয়নুল আবেদীন ইবনুল হুসাইন আস-সাদিক রহমতুল্লাহু আলাইহ (৮০-১৪৮ হি. = ৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রহমতুল্লাহু আলাইহ (৭০-১৪৫ হি. = ৬৯০-৬৬২ খ্রি.), হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ আসলম ইবনে সাফওয়ান রহমতুল্লাহু আলাইহ (২৭-১১৪ হি. = ৬৪৭-৭৩২ খ্রি.), হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া ইবনুয যুবারর ইবনুল আওয়াম আল-আসদী রহমতুল্লাহু আলাইহ (৬১-১৪৬ হি. = ৬৮০-৭৬৩ খ্রি.), হযরত নাকি ইবনে জুবায়র ইবনে মুতইম রহমতুল্লাহু আলাইহ (০০০-৯৯ হি. = ০০০-৭১৭ খ্রি.), হযরত ইকরামা ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদানী রহমতুল্লাহু আলাইহ (২৫-১০৫ হি. = ৬৪৫-৭২৩ খ্রি.) এবং হযরত আমর ইবনে শুরাহওয়ীল আল-হামদানী রহমতুল্লাহু আলাইহ (০০০-৬৩ হি. = ০০০-৬৮২ খ্রি.) প্রমুখ।^১

তবে ফিকাহশাফ্বে তাঁর প্রধান শিক্ষক হলেন হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান রহমতুল্লাহু আলাইহ। ইমাম হাম্মাদ রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর ছাত্রদের মধ্যে হিফয ও মেধা শক্তির দিক দিয়ে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মতো কেউ ছিল না বিধায় ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ তাঁর শিক্ষক হাম্মাদ রহমতুল্লাহু আলাইহ ও সহপাঠী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। হযরত হাম্মাদ রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর ইন্তিকালের পর সকলে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এক বছরকাল তিনি তাঁর শিক্ষক হযরত হাম্মাদ রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর শিক্ষালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং সমসাময়িক যুগে ইসলামী আইনশাস্ত্রের অনন্য সাধারণ ইমাম ও ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন।^২

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর ছাত্র সংখ্যাও গণণাতীত। ইসলামী শরীয়তের ইমামদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য ছাত্রসংখ্যা এবং তাঁর ছাত্রদের সমপর্যায়ের ছাত্র কারো মধ্যে দেখা যায় না। ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবীব আল-আনসারী রহমতুল্লাহু আলাইহ (১১৩-১৮২ হি. = ৭৩১-৭৯৮), ইমাম যুফার

^১ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

^২ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

ইবনুল হুযায়ল আল-আনবারী (১১০-১৫৮ হি. = ৭২৮-৭৭৫ খ্রি.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে ফরকদ আশ-শায়বানী (১৩১-১৮৯ হি. = ৭৪৮-৮০৪ খ্রি.), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ আল-লুলুওয়া (০০০-২০৪ হি. = ০০০-৮১৯ খ্রি.) প্রমুখ তাঁর সেসব কৃতিত্বপূর্ণ সুযোগ্য ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা অসীম ত্যাগ ও কর্মের মাধ্যমে হানাফী ফিকাহকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ইমাম আযম (রাহিমুল্লাহ) -এর বুদ্ধিমত্তা

ইমাম আযম (রাহিমুল্লাহ) অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। যে কোন জটিল ও কঠিন বিষয়কে তিনি খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কুরআন, হাদীস ও যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি এমনই সমাধান প্রদান করতেন যে, যার পর আর কোনো কথা বলার অবকাশ থাকতো না। এ ব্যাপারে ফিকহী হানাফীর প্রতিটি উসূল ও মাসআলা তো উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। তা ছাড়া তাঁর পবিত্র জীবদ্দশায় এমন সব কঠিন সমস্যা ও মাসআলার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা তাঁর সমসাময়িক বড় বড় জ্ঞানীরা পর্যন্ত সমাধান দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। এমন সব ফতোয়ার সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে কয়েকটি ফতোয়ার উল্লেখ করা হলো:

একদিন ইমাম আযম (রাহিমুল্লাহ) ইমাম সুফয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মাসরু'ক আস-সওরী (৯৭-১৬১ হি. = ৭১৬-৭৭৮ খ্রি.) ও কাজী আবু লায়লা (রাহিমুল্লাহ) -সহ এক বৈঠকে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক লোক একটি মাসআলা পেশ করলেন যে, কয়েকজন লোক এক স্থানে বসা ছিলো, হঠাৎ একটি সর্প এক ব্যক্তির গায়ে পড়লো। সে ভীত হয়ে সাপটিকে ছুঁড়ে মারলে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়ে পড়লো। সেও প্রথম ব্যক্তির মতো লাফ মারলে সাপ তৃতীয় ব্যক্তির ওপর পড়লো। তৃতীয় ব্যক্তিও দ্বিতীয় ব্যক্তির মতো লাফ মারলো, চতুর্থ ব্যক্তি গায়ে পড়লো। সাপটি চতুর্থ ব্যক্তির গায়ে পড়ে তাকে দংশন করলো। তৎক্ষণাৎ সে মারা গেল। এখন প্রশ্ন হলো চতুর্থ মৃত ব্যক্তির দিয়ত (মৃত্যুপণ)-কে আদায় করবে?

বিভিন্নজন নানা উত্তর প্রদান করলেন। কোনটাই সন্তোষজনক না হওয়ায় গৃহীত হলো না। অবশেষে ইমাম আযম (রাহিমুল্লাহ) বললেন, দেখুন! প্রথম ব্যক্তি থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর সাপটা পড়াতে সে অপরাধী হল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি লাফ মেরে আত্মরক্ষা করতে সাপটি তৃতীয় ব্যক্তির ওপর পড়লো। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি অপরাধ মুক্ত হয়ে গেলো। এভাবে অন্যান্য ব্যক্তিরও নিরপরাধ। তবে শেষ ব্যক্তির ব্যাপারে দুটি কথা। যদি সাপটি ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে সাপে কামড়ায় এবং সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে শেষ ব্যক্তির ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। আর যদি

কিছুক্ষণ পরে কামড়ায়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণের দায় হতে রেহাই পাবে। কারণ মৃত ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাবার সময় পেয়েও চেষ্টা করেনি। অতএব তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর এ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা সবাইকে মুগ্ধ করল।^১

ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদিন এক ব্যক্তি রাগতস্বরে তালাকের শপথ করে আপন স্ত্রীকে বলল যে, আমি ওই সময় পর্যন্ত তোমার সাথে কথা বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কথা না বলবে। উত্তরে স্ত্রীও শপথ করে বলল যে, আমিও আপনার সাথে ওই সময় পর্যন্ত কথা বলবো না, যতক্ষণ আপনি আমার সাথে কথা না বলবেন। তখনকার আলিমগণ ফতোয়া দিলেন যে, তাদের মধ্যে যেই কথা বলুক শপথ ভঙ্গ হবে এবং তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর নিকট এ সমস্যার সমাধান চাওয়া হলে তিনি বললেন, যাও গিয়ে আপন স্ত্রীর সাথে কথা বলো। এতে অসুবিধা নেই। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর এ ফতোয়া শুনে হযরত সুফ্ফয়ান আস-সাওরী রহমতুল্লাহু আলায়হি বললেন, জনাব! আপনি হারামকে হালাল করলেন কি করে? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি এবার ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন, বললেন, স্বামী শপথ করেছিল যে, সে স্ত্রীর কথা বলার পূর্বে কথা বলবে না। এটা শ্রবণে তার স্ত্রীও এভাবে শপথ করলেন। আর যখন শপথ করলেন এতে স্ত্রী আপন স্বামীর সাথে কথা বলেই শপথ করলেন। আর যখন স্বামী তার সাথে কথা বলবে তখন এ কথা স্ত্রীর পরেই হবে। কেননা স্ত্রী শপথ করে এর পূর্বে প্রথমেই কথা বলে ফেলল। আর যখন স্ত্রী কথা বলবে তখন ওই কথা স্বামীর কথার পরে হবে। সুতরাং তাদের উভয়ের মধ্যে শপথ ভঙ্গ হলো না। এটা শ্রবণে ইমাম সুফ্ফয়ান আস-সাওরী রহমতুল্লাহু আলায়হি নিরন্তর হয়ে গেলেন।^২

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর এলাকায় এক শিয়া বাস করত। সে হযরত ওসমান রহমতুল্লাহু আলায়হি-কে ইহুদী বলতো। তার একজন বিয়ের যোগ্য কন্যা ছিল। তাঁর জন্য সে পাত্র খুঁজছিলো। একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি তাকে গিয়ে বললেন, তুমি নাকি তোমার মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছো? একটি ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, ছেলেটি যেমন শরীফ খান্দানী, তেমনি সম্পদশালী। সাথে সাথে সে অত্যন্ত পরহেযগার, হাফেযে কুরআন। শিয়া লোকটি বললো, তাহলে এই ছেলেটি ঠিক করে দিন। এমন সৎপাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি বললেন, কিন্তু ভাই একটি কথা, ধর্মে সে ইহুদী। একথা শুনে শিয়া লোকটি খুব রাগান্বিত হলো। বললো, কী আশ্চর্য! এত বড় একজন ইমাম হয়ে একজন ইহুদীর সাথে আমার

^১ সাদেক শিবলী জামান, *ইমাম আবু হানিফা*, পৃ. ৯৮

^২ গোলাম রাসুল সাদ্দি, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৩

মেয়ের বিয়ে দিতে বলেছেন? ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি বললেন, তাতে কি? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইহুদীর কাছে নিজ কন্যা বিয়ে দিয়েছেন, তাও আবার একজন নয়, একে একে দু'জন। তিনি যদি তা করতে পারেন তবে তোমার আপত্তি কিসের? আল্লাহর কী অপার রহমত! এতটুকু কথায় শিয়া লোকটির চেতনা ফিরে আসলো। সে তওবা করে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

একদিন ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি-এর নিকট জনৈক শত্রু এসে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলো, যে বেহেশতের আশা ও দোযখের ভয় রাখে না এবং আল্লাহকেও ভয় করে না, মৃত ভক্ষণ করে, রুকু-সিজদা ছাড়া নামায পড়ে, না দেখে সাক্ষী দেয়, সত্য পছন্দ করে না, ফিতনা ভালোবাসে, রহমত থেকে পালায়, ইহুদী-নাসারাকে সত্যায়িত করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ফতোয়া বা রায় কী? অতঃপর ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি তাঁর শিষ্যদেরকে সম্বোধন করে বললেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? তাঁরা উত্তরে বললেন, সে অত্যন্ত খারাপ লোক, কারণ এ ধরনের আচরণ কাফিরদের মধ্যেই থাকে। এটা শুনে ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি হেসে বললেন, ঠিক নয়। বরং সে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু ও প্রকৃত মুমিন, এতে সবাই আর্হান্বিত হলো। আর ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে বললেন, আচ্ছা, আমি যদি এর সঠিক উত্তর দিই, তুমি আমার দুর্নাম করা থেকে বিরত থাকবে কী? সে বলল, হ্যাঁ হুযুর, আমি ওয়াদা করলাম। তখন ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি উত্তর বলতে আরম্ভ করলেন,

১. লোকটি বেহেশতের আশা রাখে না, সে বেহেশতের মালিকের আশা রাখে।
২. দোযখের ভয় রাখে না, কিন্তু দোযখের মালিককে ভয় করে।
৩. আল্লাহকে ভয় করে না মানে আল্লাহ তাঁর প্রতি জুলুম করবেনা বলে ভয় রাখে না।
৪. মৃত খায় অর্থাৎ সে মাছ খায়।
৫. রুকু-সিজদা ছাড়া নামায পড়ে মানে সে জানাযার নামায পড়ে।
৬. না দেখে সাক্ষী দেয় মানে সে আল্লাহকে না দেখে সাক্ষী দেয়।
৭. সত্যকে পছন্দ করে না মানে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে পছন্দ করে না, কারণ সে জীবিত থাকলে আল্লাহর খুব বেশি ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে।
৮. ফিতনাকে ভালোবাসে মানে সে সম্পদ এবং সন্তানকে ভালোবাসে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা কুরআনে সম্পদ ও সন্তানকে ফিতনা বলেছেন।
৯. আল্লাহর রহমত হতে পালায় মানে বৃষ্টি থেকে পালায়।
১০. ইহুদী ও নাসারাকে সত্যায়িত করে অর্থাৎ তাদের কথা কুরআনের ভাষায়:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْنَصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ الْنَصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ ۝

‘ইহুদীরা বলে নাসারা কোন ধর্মের ওপর নেই এবং নাসারা বলে ইহুদীরা কোন ধর্মের ওপর নেই।’^১

লোকটি এ কথার প্রতি সত্যায়িত করে। এ সঠিক উত্তর শুনে প্রশ্নকারী শত্রু লোকটি তখনই দাঁড়িয়ে ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি-এর মস্তক চুম্বনপূর্বক শপথ করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয় সতের ওপর আছেন।^২

এতে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি-কে এতো ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন যে, বড় কঠিন মাসআলা যা কেউ বলতে পারে না, তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে তা বলে দিতেন। এতে আরও প্রমাণিত হলো যে, তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের কথা শত্রুরাও মেনে নিত।

স্বভাব-চরিত্র

ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি জ্ঞান-গরিমায় যেমন যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তেমনি উত্তম স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়েও ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমুল্লাহ খলীফা হারুনুর রশীদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাহদী ইবনুল মানসুর আল-আব্বাসী (১৪৯-১৯৩ হি. = ৭৬৬-৮০৯ খ্রি.)-এর দরবারে আপন উস্তাদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। একদিন খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি-এর চরিত্র বর্ণনা করতে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি-কে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি বললেন, আমার সম্মানিত উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। নিষিদ্ধ বস্তু থেকে মুক্ত থাকতেন। অধিকাংশ সময় চুপ থেকে চিন্তা করতেন। যদি কেউ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করত যদি তিনি তা জানতেন তবে উত্তর দিতেন। নতুবা চুপ থাকতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কারো নিকট নিজের কোন প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন না। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতেন। দুনিয়ার জাঁকজমক ও ইজ্জত-সম্মানকে তুচ্ছ মনে করতেন। গীবত থেকে মুক্ত থাকতেন, কারো আলোচনা হলে তার উত্তম দিকগুলো বর্ণনা করতেন। সম্পদের মতো ইলম বিতরণ করতেও খুব আগ্রহী ছিলেন। খলীফা হারুনুর রশীদ এ সমস্ত কথা শুনে বললেন, নেককার ও উত্তম লোকদের এ চরিত্র হয়ে থাকে। আর আপন কেরানীকে তা লিখে রাখতে বললেন এবং আপন সন্তানকে তা স্মরণ রাখতে বললেন।^৩

ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি আরো বললেন, ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ আলিয়াহি যদি কাউকে কোন কিছু দান করতেন আর গ্রহীতা এতে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১১৩

^২ ইবনে হাজার আল-হায়তামী, আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৫৫

^৩ গোলাম রাসুল সাঈদী, তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৫৪

তিনি দুঃখভরে বলতেন, কৃতজ্ঞতার একমাত্র হকদার আল্লাহই। যার দেয়া সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছি, এতে আমার কি বিশেষত্ব থাকতে পারে? তিনি আরও বলেন, ইমাম আযম রহমতুল্লাহি পুরো বছর আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ নিজেই বহন করতেন। একদিন আমি বললাম, হুযুর! আপনার মতো দানশীল লোক আমি দেখিনি। এতে তিনি বললেন, তুমি আমার উস্তাদ হাম্মাদকে দেখনি, অন্যথায় এমন কথা কখনো বলতেন না।^১

একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহি বাজারে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে এক ব্যক্তি লুকিয়ে গেলো। তিনি ওই ব্যক্তিকে ডেকে লুকিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, লোকটি বললো, হুযুর! আপনার কাঁছ থেকে দশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলাম, অভাবের কারণে তা আজও পরিশোধ করতে পারিনি বিধায় লজ্জায় লুকিয়ে পড়েছি। তার কথায় ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর অন্তরে অত্যন্ত দয়ার উদ্বেক হলো যে, তার সমুদয় ধারকৃত টাকা মাফ করে দিলেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনুল হাসান আল-হুসাইন আর-রাযী রহমতুল্লাহি (৫৪৪-৬০৬ হি. = ১১৫০-১২১০ খ্রি.) লিখেছেন যে, একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহি কোথায় যাচ্ছিলেন, রাস্তা ছিলো কাদায় পরিপূর্ণ। পশ্চিমধ্যে তাঁর পদাঘাতে রাস্তার কাঁদা এক ব্যক্তির ঘরের দেয়ালে গিয়ে লাগলো। এতে তিনি ভাবলেন যে, যদি কাঁদা তুলে নিয়ে দেয়াল পরিস্কার করা হয় দেয়ালের মাটি নষ্ট হবে আর যদি এমনিভাবে ছেড়েও দেওয়া হয় তবে এক ব্যক্তির দেয়াল আবর্জনা করার সমতুল্য। এখন কি করা যায়, এ চিন্তায় তিনি মগ্ন। এমন সময় ঘরের মালিক বেরিয়ে আসলো। ঘটনাক্রমে লোকটি ছিলো ইহুদী আর হুযুরের কর্জগ্রস্থ। হুযুরকে দেখে সে ভাবলো হয়তো হুযুর টাকা দাবি করতে এসেছেন। ফলে সে হুযুরের নিকট কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। এতে হুযুর বললেন যে, কর্জের কথা ছেড়ে দাও, আমি তো চিন্তা করছি তোমার দেয়াল কি করে পরিস্কার করতে পারি। কাঁদা পরিস্কার করলে তোমার দেয়ালের ক্ষতি হয় আর না করলে অপরিষ্কার থেকে যায়। ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহি-এর এ কথা শুনে ইহুদী বলে উঠলো হুযুর! দেয়াল পরে পরিস্কার করা যাবে, প্রথমে কলেমা পড়িয়ে আমার অন্তর পরিস্কার করে দিন।^২

একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর নিকট জনৈক মহিলা মূল্যবান একটি রেশমী শাড়ি বিক্রয়ের জন্য আনেন, ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহি মূল্য জিজ্ঞাসা করলে মহিলাটি বলল, ১০০ দিরহাম। প্রকৃত মূল্য স্ত্রী লোকটির জানা ছিল না। অথচ ইমাম আযম তাকে বললেন, এ কাপড়ের মূল্য তা অপেক্ষা অনেক বেশি।

^১ গোলাম রাসুল সাদ্দি, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৫

^২ গোলাম রাসুল সাদ্দি, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৬

মহিলাটি বলল, তাহলে আমাকে দু'শত দিরহাম দিন। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ বললেন, আমি এর মূল্য পাঁচশত দিরহাম দেব। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন বুঝি? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ বললেন, উপহাস নয়। অতঃপর ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ এটা পাঁচশত দিরহাম অর্থাৎ উচিত মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন।

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ বসরা দেশীয় একব্যক্তির সাথে অংশীদারে ব্যবসা করতেন। একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ সত্তরটি কাপড়ের তান তাঁর বন্ধুর নিকট পাঠালেন এবং সাথে চিঠির দ্বারা একথাও বলে দিলেন যে, অমুক কাপড় কিছু ত্রুটি রয়েছে, তুমি বিক্রয়কালে ক্রেতাকে এটা অবহিত করিয়ে দেবে, যাতে ক্রেতার ক্ষতি না হয়। কিন্তু বিক্রয়কালে সেই অংশীদার বন্ধু ক্রেতাকে কাপড়ের ত্রুটির কথা বলতে ভুলে যায় ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে উক্ত কাপড় বিক্রি করে দেন। এ কথা জানতে পেরে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ সেই ত্রিশ হাজার দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।^১

এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার-ব্যবহার, লেনদেন সর্বত্র ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন যে, আমি কুফাবাসীর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ দেখিনি। আল্লাহভীতির মধ্যে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হারাম বস্তু থেকে এটুকু পরিমাণ বিরত থাকতেন যে, কোন কোন সময় সন্দেহের কারণে তিনি অনেক হালাল সম্পদকেও পরিত্যাগ করতেন। তাঁর তাকওয়ার পরিপূর্ণতার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি কখনো কোন খলীফা বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির উপটোকন গ্রহণ করতেন না।^২

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও খুব সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার মাসিক খোরাকী দু'দিরহামের বেশি নয়। কখনো ছাতু আর কখনো রুটি আমার খাদ্য। ভোগ-বিলাসের জন্য নয় বরং আল্লাহর সৃষ্টি জীবের উপকার ও আত্মসম্মান রক্ষার মানসেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। আমীর-ওমরাদের প্রতি হাত প্রসারিত করতে হবে বলে আমার ভয় হতো, তবে আমি আমার কাছে এক দিরহামও রাখতাম না।^৩

বন্ধু-বান্ধব ও সাক্ষাতকারীদের জন্য তিনি কিছু দৈনিক খরচ বরাদ্দ রাখতেন। ওলামা ও মুহাদ্দিসের জন্য তাঁর ব্যবসায়ের কিছু অংশ নির্দিষ্ট ছিল। যার

^১ গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৭

^২ গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৭

^৩ গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৭

মুনাফা বছরান্তে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। গরীব ছাত্রদের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করতেন এবং অভাবী মনে হলে খুব বদান্যতার সাথে তার অভাব মোচন করতেন।^১

ইবাদত ও রিয়াযত

আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান আয-যাহাবী রাহিতুয়াহি (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.) বলেন, ইমাম আযম রাহিতুয়াহি-এর নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করা ও পুরো রাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকার ঘটনা বিস্তৃত সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাতে আল্লাহভীতিতে এতো বেশি ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পড়তো।

হযরত ফযল ইবনে ওয়াকীল রাহিতুয়াহি বলেন, আমি তাবেঈদের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিতুয়াহি-এর ন্যায় এতো খোদাভীতি নিয়ে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। প্রার্থনাকালে আল্লাহর ভয়ে তাঁর চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যেত। পবিত্র রমযানে দিবরাত্রি এক খতম কুরআন আদায় করতেন। ৩০ বছর পর্যন্ত সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন। প্রতি রাকাতাতে এক খতম কুরআন শরীফ আদায় করেছেন। উপরন্তু তিনি একাধারে দীর্ঘ ৪০ বছর ইশার অযু দিয়ে ফজর নামায আদায় করেছেন।^২

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ইমাম আযম রাহিতুয়াহি-এর অভিমত হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। আল্লাহ তাআলার প্রতিভূ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ অপরিহার্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধানসমূহ চিরন্তন ও চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। খিলাফত সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট। বিজ্ঞজনদের (আহলুর রায়ের) সঙ্গে পরামর্শ ও জনগণের স্বাধীন সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হবেন। শক্তি বলে ক্ষমতা দখল করে পরবর্তীতে জবরদস্তী করে জনগণের সম্মতি আদায় করাকে তিনি অবৈধ ও অনৈসলামিক পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন। খলীফা মনসুর আল-মুনতাসির বিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আয-যাহির বি-আমরিবিল্লাহ ইবনুন নাসির আল-আব্বাসীর সম্মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর খিলাফত সম্পর্কে তিনি নিঃসংকোচে এ রূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইমাম আযম রাহিতুয়াহি-এর মতে, পদ মর্যাদার দিক হতে প্রধান বিচারপতির স্থান রাষ্ট্রপ্রধানের অব্যবহিত পরেই; রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিকে বিশেষ বিশেষ কারণে অপসারণ করতে পারেন, কিন্তু বিচারপতি স্থায়ী পদে সমাসীন থাকাকালে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। বিচারকের রায় রাষ্ট্রপ্রধান মেনে চলতে বাধ্য। খলীফা যদি জনগণের অধিকার খর্ব করে, তবে খলীফার আদালতের রায় মেনে নিতে

^১ গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৭

^২ গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৭

বাধ্য করার মতো শক্তি এবং সামর্থ্য বিচারপতির থাকতে হবে। কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয়া শাসনামলে বিচারপতির এরূপ স্বাধীনতা ছিলনা বলেই ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি আব্বাসীয়দের অধীনে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণে এগিয়ে যাননি। তিনি প্রয়োজনে চাবুকাঘাত সহ্য করলেন তবুও ইসলামী আদালতকে অবমাননা করেননি।

উমাইয়া শাসনের পতনের পর আব্বাসী শাসকগণ উমাইয়া বংশীয়দেরকে অকাতরে হত্যা করতে থাকেন। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি এ হত্যাযজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ করেন। আব্বাসী খলীফা মনসুর ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-কে অর্থ ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে আব্বাসী সালতানাতের পক্ষে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বিভিন্ন অজুহাতে সেই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-কে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে সুলতান মনসুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁকে কয়েদখানায় বন্দী করে চাবুকাঘাতে জর্জরিত করা হয়। কয়েদখানায় তাঁকে দিনের পর দিন কোন খাদ্য এবং পানীয় না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা হতো। পিপাসায় জর্জরিত করে জনগণের অলক্ষ্যে ক্রমশ তাঁকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া হয়। অবশেষে খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়। তবুও সত্য ও ন্যায়ের শার্দুল ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি ক্ষণিকের জন্য অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করেননি। সত্য ও ন্যায়ের ঝাঙকে চির সমুন্নত করে রেখে গেছেন। তাঁর এ আত্মত্যাগ ও নির্ভিকতা যুগে যুগে সত্যের সৈনিকদেরকে অত্যাচারী শাসক ও শোষকদের সামনে সত্যকথা বলতে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।^১

রচনাবলি

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর যুগে গ্রন্থ রচনা ও লিপিবদ্ধকরণের তেমন প্রচলন গড়ে উঠেনি। সাধারণত লোকেরা মুখস্ত করতে অভ্যস্ত ছিল। শিক্ষকের বক্তব্য নোট করে রাখা হত। এ জন্য ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর রচনাবলির সংখ্যা তেমন বেশি দেখা যায় না। তবুও তাঁর কতিপয় রচনাবলি সুধী সমাজে বেশ সমাদৃত। যেমন—

১. كِتَابُ التَّعْلِيمِ وَالْمُعَلِّمِ: এটা আকাঈদ ও উপদেশাবলি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন আর শিক্ষকের জবাব পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।
২. كِتَابُ الْوَصَايَا: বিভিন্ন সময়ে তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে যে উপদেশ দেন তা *আল-ওয়াসায়্যা* নামে পরিচিত। *কিতাবুল ওয়াসায়্যা* তাঁর উক্ত সব উপদেশমালা সংকলন করা হয়েছে।

^১ শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ (১৯৫৫), পৃ. ৫৭

৩. **أَلْفُفَةُ الْأَكْبَرُ**: এটা ইসলামী আকীদা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পরবর্তী আলিমগণ এটার বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেন। আল্লামা মোল্লা আলী সুলতান ইবনে মুহাম্মদ আল-কারী (০০০-১০১৪ হি. = ০০০-১৬০৫ খ্রি.) রচিত ভাষ্যটি সমধিক প্রসিদ্ধ। মিসর ও অন্যান্য দেশে এটা বহুবার মুদ্রিত হয়েছে।

৪. **رِسَالَةُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ** (উসমান আল-বাত্তীকে লিখিত চিঠি) এ চিঠিতে তিনি মার্জিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করেছেন।

৫. **مُسْنَدُ أَبِي حَنِيفَةَ**: তিনি যে সকল হাদীসের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন, তার শাগরিদ ও পরবর্তী হানাফী ফকীগণ এগুলোর বিভিন্ন সংকলন প্রস্তুত করেন। এ সকল সংকলন **মুসনদু আবী হানীফা** নামে পরিচিত।

৬. **কাসীদাতুন নুমান**: যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় লিখিত কাসীদা।^১

ইমাম আযম رحمته الله تعالى ও ইলমে ফিকহ

তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের এক অবিস্মরণীয় ও সম্মানিত নাম। দীনে ইসলাম তথা শরীয়তে মুহাম্মদী ﷺ-এর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ তাঁর বাণীতে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। যেমন—

«لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاولَهُ رِجَالٌ مِّنْ فَارِسٍ».

‘দীন ইসলাম যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটেও চলে যায়, তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক ওখান থেকে দীন (ইসলাম)-কে অর্জন করবে।’^২

হাদীস বিশারদগণ তাকেই প্রিয় নবী ﷺ-এর এ গৌরবান্বিত সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। গৌরবান্বিত সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত করণের দু’টি কারণ ব্যক্ত করেন।

প্রথমত উক্ত হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ দীনে ইসলাম সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট চলে যাওয়া দ্বারা একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, অনেক অনৈসলামিক মতবাদ ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করত মানুষ দীন ইসলামের সঠিক ও স্বচ্ছ আদর্শ, নীতি থেকে দূরে অবস্থান করবে। তাই আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, তিনি এমন এক দুর্দিনে সত্যের মশাল নিয়ে আবির্ভূত হন, যখন বহুজাতি ও দেশের তাহযীব-তামদ্দুনের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সংমিশ্রণের

^১ সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২, পৃ. ৩৬১-৩৬২

^২ আস-সুন্নুতী, *আল-ফতহুল কবীর ফী যাম্মিয় যিয়াদ ইলাল জামিউস সগীর*, খ. ৩, পৃ. ৪২, হাদীস: ১০০৫২—হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه-বর্ণিত

ফলে বহু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া মুসলিম সমাজের মধ্যে গ্রীক দর্শনের বহুল প্রসারের ফলে ইসলামী চিন্তধারায় অনেক তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল এবং ইসলামের চিন্তা-চেতনায় অনেক অনৈসলামিক মতবাদ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইসলামের এমন দুর্দিনে তাঁর আবির্ভাব সত্যিই প্রিয় নবী ﷺ-এর উপরোক্ত বাণীর বাস্তবতা।

দ্বিতীয় নবী করীম ﷺ এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পারস্য দেশীয় হবে বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। এদিক দিয়েও তিনি প্রিয় নবী ﷺ কর্তৃক সংবাদপ্রাপ্ত প্রারম্ভিক যুগে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র হিসেবে ফিকাহশাস্ত্রের বিকাশ বরং তা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিল। কোন সমস্যা দেখা দিলে হুযুরপাক ﷺ থেকে সহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করে সমাধান করে নিতেন। নবী করীম ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদীন ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণের যুগে ইলমে ফিকহ-এর প্রয়োজনীয়তাও তেমন অনুভব হয়নি। উমাইয়া শাসনামল থেকে যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং অনারব জাতির সংমিশ্রণে ইসলামে নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে, তখন এ সকল উদ্ভূত নবতর সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার দরুন সমাজের ন্যায়-নীতি বিঘ্নিত হওয়ার মারাত্মক আশংকা সৃষ্টি হয়। এভাবে দিন দিন বিভিন্ন বাতিল মতবাদ ফিতনা-ফাসাদ বেড়ে যাওয়ায় সময়ের প্রয়োজনীয়তা এবং যুগের চাহিদা মাক্ফি ইমাম আযম رحمۃ اللہ علیہ আলায়াহ, তাঁর ছাত্র ইমাম ইউসুফ رحمۃ اللہ علیہ আলায়াহ ও ইমাম মুহাম্মদ رحمۃ اللہ علیہ আলায়াহ একটি দল গঠন করে ইলমে ফিকহের উসূলুল কাওয়ানীন বা ফিকহের নীতিমালার বিভিন্ন ধারা-উপধারা প্রণয়নে এগিয়ে আসেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত নীতিমালা ও কায়দাসমূহের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী ইমাম ও মুজতাহিদ ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব রচনা করেন।

তাই তিনি ইলম ফিকহ-এর প্রথম স্থপতি ও প্রবর্তনকারী হিসেবে বিশ্বের দরবারে খ্যাতি অর্জন করেন। আর এজন্য তাঁকে ‘ইমাম আযম’ তথা ইমামকুলের শিরোমণি রূপে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ফিকহশাস্ত্র বাদ দিলে যেমন মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না; তদ্রূপ ইমাম আযমকে বাদ দিয়ে ফিকহশাস্ত্রের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক কথায় বলতে গেলে, ফিকহশাস্ত্রের অপর নাম আবু হানারী আবু আবু হানারী দ্বিতীয় নাম ইলমে ফিকহ।^১

ইলমে ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে ইমাম আযম رحمۃ اللہ علیہ আলায়াহ-এর অবদান ইমামগণের ওপর কতটুকু ছিল তা তাঁদের বাণী থেকে সহজে জানতে পারি। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হলো। ইমাম আযম সম্পর্কে ইমাম

^১ আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৪৪

মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে ওসমান আশ-শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলায়হি (১৫০-২০৪ হি. = ৭৬৭-৮২০ খ্রি.) যথার্থ বলেছেন, ‘সকল মানুষ (ইমাম মুজতাহিদ সবাই) ফিকহশাফে ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর সন্তানস্বরূপ।’

ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলায়হি আরও বলেছেন, ‘যদি কোন ব্যক্তি ইলমে ফিকহের মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে যেন ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি এবং তাঁর শিষ্যগণের সান্নিধ্য অবশ্যই গ্রহণ করে।’

একদিন ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর উস্তাদ ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলায়হি-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-কে দেখেছেন? এর জবাবে ইমাম মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী রহমতুল্লাহি আলায়হি (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.) বলেন, ‘হ্যাঁ! আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যদি তিনি তোমার সাথে এ স্তরের ব্যাপারে একে স্বর্ণ বলে দাবি করেন, তবে তিনি যুক্তি তর্কে বিজয়ী হবেন।’

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর উক্তি দ্বারা ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার কথা সহজে অনুমেয়।

ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন ইবনে আওন ইবনে যিয়াদ রহমতুল্লাহি আলায়হি (১৫৮-২৩৩ হি. = ৭৭৫-৮৪৮ খ্রি.) বলেন, ‘ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর ফিকহই আসল ফিকহ।’

ইমাম জুরজানী রহমতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, যদি হযরত মুসা রহমতুল্লাহি আলায়হি ও হযরত ঈসা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর উন্মত্তের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মতো একজন জ্ঞানী থাকতেন, তবে তারা কখনো ইহুদী এবং নাসারা হতো না। অবশ্যই হক ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত।^১

ইমাম আলা উদ্দিন মুহাম্মদ আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-হিসনী আল-খাসকফী রহমতুল্লাহি আলায়হি (১০২৫-১০৮৮ হি. = ১৬১৬-১৬৭৭) আদ-দুররুল মুখতারের ভূমিকায় ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন, ‘এ আলোচনার সার কথা হল যে, ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি পবিত্র কুরআনের পরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম মহান মুজিয়া স্বরূপ।’^২

এমন কি এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা রহমতুল্লাহি আলায়হি ও হযরত মাহদী রহমতুল্লাহি আলায়হি উভয়েই ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযহাব অনুযায়ী বিধি-বিধান জারি করবেন।^৩

^১ আল-হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার শরহ তানওয়ীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, খ. ১, পৃ. ৫৩

^২ আল-হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার শরহ তানওয়ীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬

^৩ আবুল হাসান যায়দ আল-ফারুকী, সাওয়ানেখ-ই-ইমাম আযম, খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬

যা হোক, ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর ফযীলত এবং জ্ঞানের ব্যাপকতা বিধি-বিধান দুনিয়ার ইমাম ও মুজতাহিদগণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ইবনে ওয়াযিহ আল-হানযলী রহমতুল্লাহি (১১৮-১৮১ হি. = ৭৩৬-৭৯৭ খ্রি.)-এর মতে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশে ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি যে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন, উক্ত শাস্ত্রের পাঠকদেরকে তা সর্বদাই স্বরণ করিয়ে দেয়। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর মাযহাবকে ব্যক্তিগত মত (রায়) ভিত্তিক বলে অমূলক ধারণা পোষণ করেন। অথচ *কিতাবুস সিয়ানা* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর সংকলিত মাসআলার সংখ্যা বার লক্ষ নব্বই হাজারের উপরে। ইসলামী জীবনধারার বিভিন্ন দিক-ইবাদত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির শিল্প, রাজস্ব, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত এক বিপুল সংখ্যক প্রশ্নের সমাধানে তাঁর অভিমতের মূল সূত্র কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী আইন সংকলনের ব্যাপারে তিনি যে পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা ছিল খুবই ব্যাপক এবং দুরূহ। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সাত শতাধিক শাগরিদের মধ্য হতে চল্লিশজনের সমন্বয়ে একটি আইন পরিষদ গঠন করেন, যাদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহি, ইমাম যুফর রহমতুল্লাহি, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহমতুল্লাহি, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের ন্যায় প্রসঙ্গি মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আইনবিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মতের সাথে তাঁর শাগরিদের মতামত সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী আইনচর্চা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে ত্রিশ বছর যাবত ইসলামী শরীয়া আইনের সামগ্রিকভাবে বিধিবদ্ধকরণ এর কার্য অব্যাহত থাকে। তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর প্রস্তুত ফাতোয়াসমূহ সাথে সাথেই সর্বমহলে প্রচারিত হয়ে যেতো। এভাবে তাঁর নেতৃত্বে সংকলিত ইসলামী শরীয়া আইন মুসলিম জগতের অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রীয় বিধিরূপে পরিগৃহীত হয়।^১

ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর শাগরিদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহি-এর ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনে আবী লায়লা, আর-রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওয়াঈ এবং কিতাবুল খারাজ আর ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী রহমতুল্লাহি রচিত আল-মাবসুত, আল-জামিউস সাগীর, আল-জামিউল কবীর, আস-সিয়ারুল কবীর, আস-সিয়ারুস সাগীর ও অন্যান্য গ্রন্থ ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি-এর আইন সংক্রান্ত চিন্তধারার উল্লেখযোগ্য মৌলিক উৎস। ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর অনুসারীদের জীবনী ও কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলে ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-কে

^১ (খ) আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৪৪; (খ) সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২, পৃ. ৩৬০

সহজেই অনুমান করা যায়। সামগ্রিক বিচারে ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি ফিকহী চিন্তা-ভাবনা তৎকালীন কুফার অন্যান্য ফকীহদের চিন্তা-ভাবনা হতে অনেক উন্নত ছিল। তিনি আইনের উৎস নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের সমসায়িক ধরণ-পদ্ধতির তাত্ত্বিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ইসলামী আইনের প্রয়োগিক বিধি-বিধানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছিলেন।^১

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি সরকারি কোন পদে অধিষ্ঠিত না থাকার কারণে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাঁর আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারা কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে চতুর্বিদ দলীলের ব্যাপক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রয়োগিক বিচার বিশ্লেষণে তা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ছিল সর্বোপরি তা ছিল অধিকতর বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর। সমসাময়িককালের অন্যান্য ফকীহ ফিকহী বিষয়াদিতে রায় ও কিয়াসকে যতটুকু স্থান দিয়েছেন, তিনিও ততটুকুই গুরুত্ব দিতেন এবং খবর-ই-আহাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কাল হতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম সমাজের প্রচলিত কোন আকীদা পরিহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর অবিস্মরণীয় অবদান হলো, তিনি ইসলামী আইনের চারটি মৌলিক সূত্র নির্ধারণ করেন, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এ ছাড়া তিনি ইসতিহসানকেও পঞ্চম সূত্র হিসেবে গণ্য করেন। কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি শাদ্বিক ব্যাখ্যার অনুসারী খারেজি সম্প্রদায় এবং নিছক যুক্তিবাদের অনুসারী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের তুলনায় একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন। কুরআনের মুহকাম আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত মৌলিক নীতির আলোকে এবং প্রামাণ্য হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি অত্যাধিক সাবধানতা অবলম্বন করেন। পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে যেই হাদীসটির মর্ম সর্বদিক দিয়ে যুক্তি-সংগত বিবেচিত হত তিনি সেইটি গ্রহণ করতেন। বিরোধীয় বা বিতর্কিত সকল হাদীস পরিত্যাগ করে তিনি নতুন কোন অভিমত গ্রহণ করতেন না। সাহাবীদের মতভেদের ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করতেন। এটার কারণ সম্পর্কে তিনি বলতেন, স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে সাহাবীরা এটা শুনবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তিনি সকল ব্যক্তিগত অভিমতের ওপর সাহাবীদের অভিমতের প্রাধান্য দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের মর্মানুযায়ী বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে কিয়াসে জলী বা সুস্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি অধিক সমীচীন মনে করতেন। এটা উসূলের পরিভাষায় ইসতিহসান বলা হয়।^২

^১ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৬০

^২ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৬১

ইমাম আযম উপরোক্ত নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে ফিকহশাস্ত্রকে গতিময়, যুগোপযোগী এবং যেকোন যুগের যেকোন পরিস্থিতির মুকাবিলা ও সমস্যার সমাধানে উপযোগী অবলম্বনও সূত্র হিসেবে বিকশিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ফিকহশাস্ত্রে কোন কোন প্রাচীন বিধি-বিধান পরিহার করে তাতে তাঁর নিজস্ব মত সংযোজন করেছেন। খতীব-বাগদাদী ^১এসব বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভাষ্যকাররূপে পরিগণিত হন। এরূপ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা তার নিজস্ব উক্তি, অনুসৃত-নীতি ও পদ্ধতি এবং তাঁর সংকলিত ফিকহ হতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। শরঈ আইন সংক্রান্ত তাঁর প্রত্যেকটি অভিমত ও সিদ্ধান্তের মূল উৎস যে কুরআন ও হাদীস প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ তাঁদের বহুগ্রন্থের বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃতি সহকারে তা প্রমাণ করেছেন। ইমাম আযম ^২এর সংকলিত ফিকহ মুসলিম বিশ্বের আব্বাসীয় যুগ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে।

আইন, বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নীতি ও আদর্শগত মতপার্থক্য জনিত অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত হতে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে রক্ষার এটার সফলতা অনস্বীকার্য। ফলে বর্তমান বিশ্বে তাঁর প্রবর্তিত ফিকহ ও মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ। এখানে ফিকহে হানফীর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। যেমন—

১. হানাফী ফিকহে শরীয়তের সমুদয় মাসাআলাসমূহ তত্ত্ব-তথ্য, হিকমত ও কল্যাণকারিতার ওপর ভিত্তিকৃত। যেমন— নামাযের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ

‘নামায অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হতে বিরত রাখে।’^১

আর রোযার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে বলেন,

لَكُمْ تَتَقُونَ ۖ

‘এ রোযার মাধ্যমে সম্ভবত তোমরা যাবতীয় পাপকার্য থেকে বেচে থাকবে।’^২

আর জিহাদের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۖ

‘যাতে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা অবশিষ্ট না থাকে।’^৩

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৪৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৩

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আত-তাহাবী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.) শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগপূর্বক হানাফী মাযহাব গ্রহণের ঘটনাও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ তাহাবী প্রথমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর হানাফী মাযহাব গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, একদিন ইমাম তাহাবী আপন মামা ইমাম মাযানী রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর কাছে পড়তে ছিলেন। তখন অধ্যয়নকালে তাঁর মামা এ মাসআলাটি পড়াচ্ছিলেন যে, যদি কোন গর্ভবতী মহিলা মারা যায় তার পেটে শিশু জীবিত থাকে, ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযহাব মতে মৃত মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করা বৈধ নয়। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে এটা বৈধ। ইমাম তাহাবী রাহমতুল্লাহি আলায়হি এ মাসআলা পড়তেই দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন, আমি ওই ব্যক্তির অনুসরণ করতে পারি না, যে আমার মত মানুষের ধ্বংস হওয়াকে বিন্দুমাত্র পরওয়া করে না। অথবা ইমাম তাহাবী রাহমতুল্লাহি আলায়হি এভাবে বললেন যে, আমি ওই ব্যক্তির মাযহাবের ওপর সন্তুষ্ট নয়, যে আমার ধ্বংসের ওপর সন্তুষ্ট। কারণ ইমাম তাহাবী তাঁর মায়ের পেটে থাকা কালে তাঁর সম্মানিত মাতা মৃত্যুবরণ করে আর ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে তাঁর মায়ের পেট কেটে তাকে বের করা হয়।

ইমাম তাহাবী রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর এ অবস্থা দেখে তাঁর মামা তাকে বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি কখনো ফকীহ হবে না। আল্লাহর অশেষ করুণায় তিনি যখন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হলেন তখন ইমাম তাহাবী প্রায়সময় বলতেন, আমার মামার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! যদি তিনি জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী স্বীয় শপথের কাফফারা আদায় করতেন। তাই বোঝা যায় ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযহাব মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি এবং কল্যাণকারিতার অধিক নিকটবর্তী ছিল। ফলে ইমাম তাহাবী রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মতো অনেক বিজ্ঞ লোকেরা যুগে যুগে এ মাযহাবকে গ্রহণ করে নেন।^২

২. হানাফী মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় একান্ত সহজ ও অনায়াস সাধ্য।
৩. মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেন-দেন ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্ব-উপাত্তের সাথে কাজ করেছেন। আর অন্যান্য ইমামগণ তার বিপরীতে বাহ্যিক নসসমূহ ও কিয়াসে জলীর সাহায্যে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৩

^২ গোলাম রাসুল সাঈদী, তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১৫৫-১৫৬

৪. হানাফী ফিকহ যিম্মী অমুসলমানদেরকে একান্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে স্বাধীনভাবে স্বীয় অধিকার ভোগ করার অধিকার সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ ভিন্ন মতবাদ পোষণ করেছেন। অমুসলমানদের প্রতি হানাফী মাযহাবের এ উদার নীতি দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়।
৫. যে সমস্ত শরীয়তের বিধি-বিধান নস বা অকাট্য দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত এবং যাতে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, সেই সকল মাসআলায় তিনি যে দলীলটি গ্রহণ করেছেন, সাধারণত তা অতি শক্তিশালী ও প্রামাণ্য। যেমন- ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ অযুর মধ্যে ফরয চারটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও অপরাপর ইমামদের কারো মতে অযুর ফরয ৫টি, ৬টি, ৮টি, নয়টি। এতে ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ-এর দলীল এই যে, কুরআন মাজীদে অযুরে আয়াতের মধ্যে চারটি অপ্সের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অযুর ফরয এ চারটিই গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট আহকামগুলো ফরযের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ-এর মাযহাবানুযায়ী এক তায়াম্মুমদ্বারা একাধিক ফরয, নফল আদায় করা যায়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন তায়াম্মুম করা ফরয। এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ-এর দলীল হলো, তায়াম্মুম হল অযুর স্থলাভিষিক্ত ও সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং অযু ও তায়াম্মুমের হুকুম এক ও অভিন্ন হবে।
৬. কুরআন হাদীসের বিধানসমূহকে ফিকহ হানাফীর মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় ও যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিকোণ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।
৭. তাহযীব-তামাদ্দুনের জন্য যা কিছু অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য মাযহাবের ফিকহ-এর তুলনায় এতে তা সমাধিক। তাই হানাফী ফিকহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বিভিন্ন লেখকের ফিকহের কিতাব অধ্যয়ন করা আবশ্যিক।^১

হানাফী মাযহাব দেশে দেশে

হানাফী মাযহাব ইরাকে জন্ম লাভ করে এবং আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে এটা সরকারি মাযহাবের মর্যাদায় উন্নীত হয়। কালক্রমে এ মাযহাব পূর্ব দিকে প্রসার লাভ করতে থাকে। বিশেষভাবে খুরাসান ও টাঙ্কানিয়াতে। সেখানে এ মাযহাবের অসংখ্য প্রসিদ্ধ ফকীহ ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। বিভূষিত হয়ে বংশানুক্রমিক হানাফী রাঈস (প্রধান)-রূপে বুখরায় রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা পরিচালনা করেন। মরক্কোতে মালিকীদের পাশাপাশি তাদের

^১ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৬০

অনুসারী হিজরী পঞ্চম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সিলিতে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে আবার হানাফী মাযহাব নবজীবন লাভ করে। তিউনিসিয়া ও মিসরেও এটা সরকারি স্বীকৃত ও অনুমোদিত মাযহাব। তুর্কী খলীফাদের সকলেই হানাফী ছিলেন। বর্তমান তুরস্ক, মধ্যএশিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিমই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।^১

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকর্তাগণ প্রধানত হানাফী মাযহাবের ফিকাহকেই তাদের রাষ্ট্রীয় আদালতে প্রয়োগ করেছিলেন। তাই উপমহাদেশে হানাফী ফিকাহ বিষয়ক বেশ কয়খানা বিখ্যাত ফাতওয়াগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে ফতোয়ায়ে হিনদিয়া বা ফতোয়ায়ে আলমগীরী নামক গ্রন্থখানা সর্বপেক্ষা অধিক বিখ্যাত। এ গ্রন্থখানা সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গঠিত একটি পরিষদ কর্তৃক রচিত হয়েছিলো।^২

অতএব হানাফী মাযহাবের ফিকহ ব্যাপক জনগণ কর্তৃক গৃহীত হবার পেছনে আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে ইমাম আবু ইউসুফ রাহমতুল্লাহু আলায়হি -এর কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত হওয়ার অসামান্য অবদান থাকলেও হানাফী মাযহাবের বিপুল জনপ্রিয়তার মূল কারণ আব্বামা শিবলী নুমানী রাহমতুল্লাহু আলায়হি (১২৭৪-১৩৩২ হি. = ১৮৫৮-১৯১৪ খ্রি.) ভাষায়: ইমাম আযম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহু আলায়হি ফিকহ মানবীয় প্রয়োজনসমূহের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ও উপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল, বিশেষত উন্নত তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে এ ফিকহ যত বেশি পরিমাণে সংগতিশীল ছিল, অন্য কোন ফিকহ সেইরূপ সংগতিশীল ছিল না।^৩

ইমাম আযম রাহমতুল্লাহু আলায়হি নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ১. হাদীস, ফিকহ, ইজতিহাদ ও তাকলীদ, ২. হাদীস-ফিকহ ও ইমাম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহু আলায়হি: একটি পর্যালোচনা পড়ুন।

নবীপ্রেম ও ইমাম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহু আলায়হি

ইমাম আযম রাহমতুল্লাহু আলায়হি -এর জীবনের প্রতিটি কর্ম নবীপ্রেমে সিক্ত ছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইসলামের শাস্বত ধারা আহলে সুন্নাত আল জামাআতের প্রকৃত মুখপত্র। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শানে রচিত তাঁর দীর্ঘ কাসীদা এ বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশ। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধকে আল্লাহপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত মনে করতেন। নবীপ্রেমেই ছিল তাঁর জীবনের অমূল্য রত্ন। তাঁর হৃদয় জুড়ে নবীপ্রেম ভরপুর ছিল। শয়নে-স্বপনে শুধু

^১ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৬০

^২ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৬০

^৩ সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩৬০

প্রিয় প্রেমাস্পদের নামই ছিল তাঁর জপমালা। প্রিয় রাসূল ﷺ-এর প্রতি ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ-এর এতো গভীর ভালোবাসা ছিল বলেই প্রিয় রাসূলের রওয়া মুবারকে উপস্থিত হয়ে তিনি যখন ‘আস-সালামু আলায়কা ইয়া সাইয়েদাল মুরসালীন’ বলে সালাম আরয করলেন, রওয়া মুবারক হতে উত্তর আসলো, ওয়া আলায়কাস সালাম ইয়া ইমামাল মুসলিমীন।^১

ইমাম আবু হানীফা রাহিমুল্লাহ-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলি

আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানীফা রাহিমুল্লাহ-কে এমন সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধন্য করেছেন যা তাঁর যুগের ও পরবর্তী যুগের কোন ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস কারো ভাগ্যে জুড়েনি। যেমন—

১. তিনি খায়রুল কুররন বা সর্বোত্তম তিন যুগের দ্বিতীয় যুগে জন্মগ্রহণ করেন। হুযুর রাহিমুল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, এ যুগের লোক পরবর্তী যুগের লোকদের থেকে উত্তম।
২. তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাহিমুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাহিমুল্লাহ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাহিমুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাই তাবৈঈর মর্যাদা লাভ করেন।
৩. তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাহিমুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাহিমুল্লাহ-সহ অনেক সম্মানিত সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৪. তাঁর শিক্ষক ও ছাত্রদের সংখ্যা অন্যান্য ইমামদের শিক্ষক ও ছাত্রদের থেকে অনেক বিজ্ঞ ও বেশি ছিল।
৫. তিনি সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলন করেন। শরীয়তের বিধি-বিধানকে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অধিকন্তু ইমাম মালেক রাহিমুল্লাহ ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ-এর সংকলিত লিপির অনুসরণ করেই মুআত্তা রচনা করেন। আর ইমাম শাফেয়ী রাহিমুল্লাহ রচনা করেন হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ আর-রিসালা।
৬. তাঁর ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি থেকেই সমস্ত ইমাম ও মুজতাহিদ সাহায্য গ্রহণ করেন। তাই ইমাম শাফেয়ী রাহিমুল্লাহ বলেছেন যে, ‘সমস্ত ফকীহ ইমাম আবু হানীফার বংশধর।’
৭. ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ-এর মাযহাব পৃথিবীর এমন দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে যেখানে তাঁর মাযহাব ছাড়া অন্যকোন মাযহাব পৌঁছেনি।
৮. মোল্লা আলী কারী রাহিমুল্লাহ-এর পরিসংখ্যান মতে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ লোক হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ লোক অন্যান্য মাযহাবের অনুসারী।

^১ ড. ফজলুর রহমান, কাসীদা-ই-নুমান (অনুদিত)

৯. তিনি কখনো কারো থেকে উপটৌকন ও প্রতিদান গ্রহণ করেননি, নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ দ্বারা নিজেই চলতেন এবং অন্যান্য আলিম, ফকীহ ও মিসকিনের মধ্যেও ব্যয় করতেন।
১০. ইবাদত ও পরহেযগারীতে তিনি যে পরিমাণ চেষ্টা ও সাধনা করতেন ইতিহাসে অন্য কোন ইমামের বেলায় এ ধরনের শ্রম-সাধনার প্রমাণ মিলে না।^১

ওফাত

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আব্বাসী খলীফাদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সারা আব্বাসী সাম্রাজ্য তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আব্বাসীয় খলীফা মনসুর তাঁকে প্রকাশ্যে কতল করতে সাহস করেনি। বরং সুলতান মনসুর কোন রূপ তাঁকে শাস্তি না দিয়ে অর্থ ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে সালতানাতের ইজ্জত বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন এবং সর্বশেষে তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি এ কূটকৌশল প্রথমেই আঁচ করতে পেরে ছিলেন। তাই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তিনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁকে আব্বাসীয় সালতানাতের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে সুলতান মনসুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁকে জেলখানায় বন্দি করে চাবুকাঘাতে জর্জরিত করা হয়। ১৫০ হি. = ৭৬৭ খ্রি. সালে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রথম জানাযায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগমন হয়। দাফন করার পরও বিশদিন পর্যন্ত তাঁর কবরের ওপর লোকেরা জানায পড়তে থাকে। বাগদাদের খেরযান নামক কবরস্থানের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ সৎলগ্ন তাঁর মাযার রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু লোক প্রতিদিনই এ মাযার যিয়ারতে আসেন।^২

ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হ কোন সমস্যায় পড়লে মিসর থেকে ইরাকে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর কবর যিয়ারতে উপস্থিত হতেন এবং দু'রাকাত নামায পড়ে তাঁর উসিলা নিয়ে দুআ করতেন। আল্লাহর রহমতে অতি তাড়াতাড়ি তাঁর প্রার্থনা কবুল হতো এবং অভাব মোচন হতো। ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহু আলায়হ আরও বলেন, 'আমি যখন ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর মাযার যিয়ারতে যেতাম, আমার নিজস্ব ইজতিহাদ ছেড়ে দিয়ে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর ইজতিহাদের ওপর আমল করতাম। কারণ তাঁর রওজায় এসে তার বিরুদ্ধ মতের ওপর আমল করাটা আমার লজ্জাবোধ মনে

^১ গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৬৬

^২ গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৬৬

হতো। তাই ইমামের পেছনে সূরা আল-ফাতিহা ও ফজরের নামাযের রুকুতে কুনুত পড়া ছেড়ে দিতাম।^১

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-এর উসিলায় এ মহান ইমামের মত, পথ ও আদর্শের ওপর আমল করার তাওফীক দিন। আমিন।

আমি আল্লাহর প্রিয়জনদের ভালোবাসি। যদিও আমি নেক্কার নই। কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রত্যাশী যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের মহাবত করার কারণে যেন আমাকেও নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

০১ জুন ২০১১
চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

^১ ইবনে হাজার আল-হায়তামী, আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৬

الْقَصِيدَةُ لِأَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

কাসীদায়ে নুমান ইবনে সাবিত

أَرْجُو رِضَاكَ وَاحْتَمِي بِحِمَاكَ

১

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا

১. হে মহান সরদার! আপনার সম্ভ্রুষ্টি ও আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে আমি আপনার কাছে এসেছি।

قَلْبًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَ

২

وَاللَّهِ يَا خَيْرَ أَلْ-خَلَائِقِ إِنَّ لِي

২. সৃষ্টির সেরা হে মহামানব! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার হৃদয় শুধু আপনাকেই চায়, আর কাউকে নয়।

وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنِّي أَهْوَاكَ

৩

وَبِحَقِّ جَاهِكَ إِنِّي بِكَ مُغْرَمٌ

৩. আপনার মহিমার শপথ! আমি আপনারই অনুরাগী। আল্লাহ জানেন, আমি কেবল আপনাকেই চাই।

كَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرَىٰ لَوْ لَاكَ

৪

أَنْتَ الَّذِي لَوْ لَاكَ مَا خُلِقَ امْرَأٌ

৪. আপনি না হলে কোন মানুষকেই সৃষ্টি করা হতো না। আপনি না হলে কিছুতেই এ নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হতো না।

وَالشَّمْسُ مُشْرِ قَةً بُنُورِهَا

৫

أَنْتَ الَّذِي مِنْ نُورِكَ الْبَدْرُ اكْتَسَبَ

৫. আপনারই নূরের নূরে চাঁদ আলোকিত হয়েছে। আপনারই নূরের আভায় সূর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| أَنْتَ الَّذِي لَمْ تَرُفِعْتَ إِلَى السَّمَاءِ | ৬ | بِكَ قَدْ سَمِتَ وَتَرَيْنَتْ لِسْرَاكَ |
|---|---|---|

৬. আপনাকে ঊর্ধ্বাকাংশ ভ্রমণ করানোর ফলেই এ আকাশ সুউচ্চ ও সুশোভিত হয়েছে।

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| أَنْتَ الَّذِي نَادَاكَ رَبُّكَ مَرْحَبًا | ৭ | وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ وَحَبَاكَ |
|---|---|---------------------------------------|

৭. আপনাকে আপনার রব (মিরাজের রাতে) সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন। তিনি আপনাকে একান্ত নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সমাদর করেছেন।

| | | |
|--|---|--|
| أَنْتَ الَّذِي فِينَا سَأَلْتَ شَفَاعَةً | ৮ | لَبَّاكَ رَبُّكَ لَمْ تَكُنْ لِسَوَاكَ |
|--|---|--|

৮. আপনি যখন আমাদের জন্য শাফা'আত চাইলেন, আপনার রব তা কবুল করলেন। এ মর্যাদা আপনি ছড়া অন্য কেউ অর্জন করেনি।

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| أَنْتَ الَّذِي لَمَّا تَوَسَّلَ آدَمُ | ৯ | مِنْ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَهُوَ أَبَاكَ |
|---------------------------------------|---|--|

৯. আপনার উসিলায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে সফল হলেন, অথচ তিনি আপনার আদি পিতা।

| | | |
|---|----|---|
| وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَصَارَتْ نَارُهُ | ১০ | بَرْدًا وَقَدْ حَمَدَتْ بُنُورُ سَنَاكَ |
|---|----|---|

১০. আপনার উসিলা দিয়ে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম দু'আ করলেন। অমনি তাঁর ওপর আগুন নিভে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

| | | |
|------------------------------------|----|---|
| وَدَعَاكَ أَيُّوبُ لِضُرِّ مَسَّهُ | ১১ | فَلَوَّيْلَ عَنْهُ الضُّرُّ حِينَ دَعَاكَ |
|------------------------------------|----|---|

১১. হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম বিপদের সময় আপনাকে ডাকলেন। অমনিতে তাঁর বিপদ কেটে গেল।

| | | |
|--|----|--|
| وَبِكَ أَلْ-مَسِيحُ أَتَى بِشِيرًا مُخْبِرًا | ১২ | بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَا دَحَا بِعُلَاكَ |
|--|----|--|

১২. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আপনার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি আপনার সৌন্দর্য আর উচ্চ মর্যাদার প্রশংসা করেছিলেন।

| | | |
|--|----|---|
| وَكَذَٰكَ مُوسَىٰ لَمَّا يَزَلْ مُتَوَسِّلًا | ১৩ | بِكَ فِي الْفِيَامَةِ يَحْتَمِي بِحِمَاكَ |
|--|----|---|

১৩. তেমনি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এই দুনিয়ায় আপনার উসিলা নিয়েছেন। আবার হাশরের দিনেও তিনি আপনার আশ্রয় চাইবেন।

| | | |
|---|----|--|
| وَالْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ خَلْقٍ فِي الْوَرَىٰ | ১৪ | وَالرَّسُولُ وَالْأَمْلَاكَ تَحْتَ لَوَاكَ |
|---|----|--|

১৪. সকল নবী-রাসূল, রাজা-বাদশাহ তথা গোটা সৃষ্টিজগৎ আপনারই বাগাতলে আশ্রয় চাইবে।

| | | |
|---|----|--------------------------------------|
| لَكَ مُعْجَزَاتٌ أَعْجَزَتْ كُلَّ الْوَرَىٰ | ১৫ | وَفَضَائِلُ جَلَّتْ فَلَيْسَ تُحَاكَ |
|---|----|--------------------------------------|

১৫. আপনার অনেক বিস্ময়কর মুজিয়া আছে। আরো আছে অগণিত মহৎ গুণাবলি, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

| | | |
|---|----|--|
| نَطَقَ الذَّرَاعُ بِسِ مَّهِ لَكَ مُعْلِنًا | ১৬ | وَالضَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِينَ أَتَاكَ |
|---|----|--|

১৬. বিষধর প্রাণী নত মস্তদুক আপনার সাথে কথা বলেছে। গোসাপও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছে।

| | | |
|---|----|--|
| وَالذُّبُّ جَاءَكَ وَالْغَزَالَةُ قَدْ أَتَتْ | ১৭ | بِكَ تَسْتَجِيرُ وَتَحْتَمِي بِحِمَاكَ |
|---|----|--|

১৭. জঙ্গলের নেকড়ে আর হরিণীও আপনার কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের জন্য এসেছে।

| | | |
|---|----|---|
| وَكَذَٰلَا الْوُحُوشُ أَتَتْ إِيْلَكَ وَسَلَّمَتْ | ১৮ | وَشَكَ الْبُعَيْرُ إِيْلَكَ حِينَ رَاكَ |
|---|----|---|

১৮. বন্য পশুরা আপনার কাছে এসে সালাম দিয়েছে। আর উট আপনাকে দেখে নিজের কথা ব্যক্ত করেছে।

| | | |
|--|----|---------------------------------------|
| وَدَعَوَتْ أَشْجَارًا أَتَتْكَ مُطِيعَةً | ১৯ | وَسَعَتْ إِيْلَكَ مُحِبَّةً لِنَدَاكَ |
|--|----|---------------------------------------|

১৯. আপনি গাছকে ডাক দিয়েছেন। আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে অনুগত গাছ আপনার পানে ছুটে এসেছে।

| | | |
|--|----|--|
| وَالْمَاءُ فَاضَ بِرِاحَتِكَ وَسَبَّحَتْ | ২০ | صُمُّ الْ-حِصَى بِالْفَضْلِ فِي يَمَنَّاكَ |
|--|----|--|

২০. আপনার পবিত্র হাত দ্বারা পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছে, আর ডান হাতে নির্বাক পাথরও তাসবীহ পাঠ করেছে।

| | | |
|---|----|--|
| وَأَلْحِجْ دُحْنَ حَنَّ إِلَى كَرِيمٍ لَقَاكَ | ২১ | وَعَلَيْكَ ظَلَّلَتِ الْعَمَامَةُ فِي الْوَرَى |
|---|----|--|

২১. যেহে আপনার মাথার ওপর ছায়া দিয়েছে। আপনার সাক্ষাৎ লাভের আশায় শুক্ক খেজুর ডালি ঢোকরে কঁদেছে।

| | | |
|--|----|---|
| وَالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ بِهِ قَدْ مَاكَ | ২২ | وَكَذَاكَ لَا أَثْرَ لَمْشِيكَ فِي الثَّرَى |
|--|----|---|

২২. নরম মাটিতে আপনার চলার চিহ্ন পড়েনি। আবার কঠিন পাথরে আপনার দু'পায়ের ছাপ বসে গিয়েছে।

| | | |
|---|----|--|
| وَمَلَأْتَ كُلَّ الْأَرْضِ مِنْ جَذْوَاكَ | ২৩ | وَشَفَيْتَ ذَ الْعَاهَاتِ مِنْ أَمْرَاضِهِ |
|---|----|--|

২৩. আপনি রোগীকে তাঁর রোগ-ব্যাদি হতে আরোগ্য দান করেছেন এবং নিখিল পৃথিবীকে স্বীয় অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করেছেন।

| | | |
|--|----|---|
| وَابْنَ آلِ حَصِينٍ شَفَيْتُهُ بِشَفَاكَ | ২৪ | وَرَدَدْتَ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ الْعَمَى |
|--|----|---|

২৪. এক কাতাদা রোযাহা আলহ-এর চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর রুগ্ন ইবনে হাসীন রোযাহা আলহ-কে সুস্থ করে তুলেছেন।

| | | |
|--|----|--|
| جَرَحَا شَفَيْتُهُمَا بِلَمْسِ يَدَاكَ | ২৫ | وَكَذَا حُبَيْبًا وَابْنَ عَفْرَا بَعْدَ مَا |
|--|----|--|

২৫. আহত হযরত খুবাইব রোযাহা আলহ ও ইবনে আফরা রোযাহা আলহ-কে দুহাতের পরশ বুলিয়ে সুস্থ করেছেন।

| | | |
|---|----|--------------------------------------|
| فِي خَيْرٍ فَشَفَيْتُ بِطَيْبٍ لَمْ مَاكَ | ২৬ | وَعَيٍّ مَنْ رَمَدٍ إِذْ دَاوَيْتُهُ |
|---|----|--------------------------------------|

২৬. খায়বারে আপনার ঠোঁটের সুগন্ধি লাল দ্বারা হযরত আলী রোযাহা আলহ-এর চোখের অসুখ সারিয়ে দিয়েছেন।

| | | |
|---|----|---|
| وَسَأَلْتَ رَبَّكَ فِي ابْنِ جَابِرٍ بَعْدَ مَا | ২৭ | أَنْ مَاتَ فَأَحْيَاهُ وَقَدْ أَرْصَاكَ |
|---|----|---|

২৭. আপনার দুআয় হযরত জাবের রোযাহা আলহ-এর দুই মৃত পুত্রকে জীবিত করে আল্লাহ আপনাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

| | | |
|--|----|--|
| شَآءَ اِهٖ مَسَسَتْ لِامِّ مَعْبِدِ التِّي | ٢٨ | نَشَفَتْ فُدْرَتْ مِنْ شِفَا رُفْيَاكَ |
|--|----|--|

২৮. উম্মে মা'বাদ আনহা-এর দুধ শুকিয়ে যাওয়া বকরী আপনার পবিত্র হাতের পরশে আবার দুগ্ধবতী হয়েছিল।

| | | |
|---|----|---|
| وَدَعَوْتَ عَامَ الْقَحْطِ رَبَّكَ مُعَلِّنًا | ٢٩ | فَانْهَلَّ قَطْرُ السُّحْبِ حِينَ دُعَاكَ |
|---|----|---|

২৯. অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষের বছর আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, অমনি প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

| | | |
|---|----|--------------------------------------|
| وَدَعَوْتَ كُلَّ اَلْخَلْقِ فَاَنْقَادُوا اِلَيَّ | ٣٠ | دَعَوَاكَ طَوْعًا سَامِعِينَ نِدَاكَ |
|---|----|--------------------------------------|

৩০. নিখিল সৃষ্টিকে আপনি সত্যের দাওয়াত দিলেন। সবাই আপনার দাওয়াতে স্বেচ্ছায় সাড়া দিয়েছিল।

| | | |
|--|----|---|
| وَحَفَظْتَ دِينَ الْكُفْرِ يَا عَلَمَ الْهُدَى | ٣١ | وَرَفَعْتَ دِينَكَ فَاسْتَقَامَ هَذَاكَ |
|--|----|---|

৩১. হে হেদায়তের প্রতীক! আপনি কুফরের দীনকে অবনত আর নিজের দীনকে উন্নত করেছেন। তাই আপনার পথ সুদৃঢ় হয়েছে।

| | | |
|--|----|--|
| أَعْدَاكَ عَادُوا فِي الْقَلْبِ بِجَهْلِهِمْ | ٣٢ | صَرَغَىٰ وَقَدْ حُرِمُوا الرِّضَىٰ بِجَفَاكَ |
|--|----|--|

৩২. আপনার শত্রুরা তাদের অজ্ঞতা নিয়ে অন্ধ কুপেই পড়ে রয়েছে। আপনার সাথে শত্রুতার কারণে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

| | | |
|--|----|---|
| فِي يَوْمٍ بَدْرٍ قَدْ أَتَتْكَ مَلْئِكٌ | ٣٣ | مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ قَاتِلَتْ أَعْدَاكَ |
|--|----|---|

৩৩. বদরের যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতারা এসে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

| | | |
|---|----|--|
| وَالْفَتْحُ جَاءَكَ يَوْمَ فَتَحِكَ مَكَّةَ | ٣٤ | وَالنَّصْرُ فِي الْأَحْزَابِ قَدْ وَافَاكَ |
|---|----|--|

৩৪. মক্কা বিজয়ের দিন আপনার বিজয় চূড়ান্ত হয়েছিল। জঙ্গে আহযাবে আল্লাহর সাহায্য আপনার সঙ্গেই ছিল।

| | | |
|--|----|--|
| هُودٌ وَيُؤَسُّسُ مِنْ بَهَاكَ تَجْمَلًا | ٣٥ | وَجَمَالَ يُؤَسِّفُ مِنْ ضِيَاءِ سَنَاكَ |
|--|----|--|

৩৫. হযরত হুদ আলায়হিস সালাম ও হযরত ইউনুস আলায়হিস সালাম আপনার সৌন্দর্য্যছটায় ভূষিত।
হযরত ইউসুফ, হযরত দাঈদ আলায়হিস সালাম-এর রূপও আপনারই নূরের বলক থেকে
উৎসারিত।

| | | |
|---|----|--------------------------------------|
| فَقَدْ فُقِّتَ يَا طَهَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ ءِ | ৩৬ | طُرًّا فَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَاكَ |
|---|----|--------------------------------------|

৩৬. হে রাসূল (তাহা)! আপনার স্থান সকল নবীর উপরে। প্রশংসা সেই আল্লাহর
যিনি নিশীরাতে আপনাকে নিজের কাছে সফর করিয়েছিলেন।

| | | |
|---|----|---|
| وَاللّٰهُ يَا يَسِيْنَ مِثْلَكَ لَمْ يُكُنْ | ৩৭ | فِي الْعَالِ مِثْنٌ وَحَقٌّ مِّنْ أَنْبَاكَ |
|---|----|---|

৩৭. হে রাসূল (ইয়াসীন)! যিনি আপনাকে নবী করেছেন তাঁর শপথ, সারা জাহানে
আপনার কোন উপমা নেই।

| | | |
|--|----|--|
| عَنْ وَصْفِكَ الشُّعْرَ آءٍ يَا مُدَّثِّرُ | ৩৮ | عَجَزُوا وَكَلُّوا مِنْ صِفَاتِ عِلَّاكَ |
|--|----|--|

৩৮. হে রাসূল (মুদাস্সির)! আপনার গুণাবলি বর্ণনা করায় অক্ষম। আপনার
মর্যাদা তুলে ধরতে তারা অপারগ।

| | | |
|--|----|--|
| إِنْجِيلُ عِيسَىٰ قَدْ أَسَىٰ بِكَ مُحْرِرًا | ৩৯ | وَلَنَا الْكِتَابُ أَسَىٰ بِمَدْحِ خُلَاكَ |
|--|----|--|

৩৯. হযরত দাঈদ আলায়হিস সালাম-এর ইনজিল আপনার সুসংবাদ দিয়েছিল। আমাদের
কুরআনেও আপনার প্রশংসা বিদ্যমান।

| | | |
|--|----|--|
| مَاذَا يَقُولُ آلَ مَادِحُونَ وَمَا عَسَىٰ | ৪০ | أَتَىٰ أَنْ يَجْمَعَ الْكِتَابُ مِنْ مَعْنَاكَ |
|--|----|--|

৪০. প্রশংসাকারীগণ আপনার কী প্রশংসা করবে? লেখকরাই বা আপনার গুণগাণ
কতটুকু লিখতে পারবে?

| | | |
|---|----|--|
| وَاللّٰهُ لَوْ أَنَّ الْبِحَارَ مِدَادُهُمْ | ৪১ | وَالشُّعْبُ أَقْلَامُ جُعِلْنَ لِذَاكَ |
|---|----|--|

৪১. আল্লাহর শপথ, সকল সমুদ্রও যদি কালিতে পরিণত হয়, আর গাছের
ডালগুলোকে যদি কলম বানানো হয়।

| | | |
|--|----|---|
| لَمْ يَقْدِرِ الثَّقَلَانِ يَجْمَعُ قَدْرَهُ | ৪২ | أَبَدًا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ إِذْرَاكَ |
|--|----|---|

৪২. তবুও জিন-ইনসান তাঁর মহিমা লিখে শেষ করতে পারবে না। তাঁর মর্যাদার সঠিক উপলব্ধিও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

| | | |
|---|----|--|
| وَ حُشَّاشَةٌ تَحْشَوُهُ ۖ بِهِ ۚ وَ اَكْ | ৪৩ | بِكَ بِى قُلَيْبٌ مُّغْرَمٌ يَا سَيِّدِى |
|---|----|--|

৪৩. হে আমার সরদার! আমার হৃদয় আপনারই আসক্ত। আমার প্রাণ শুধু আপনারই ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

| | | |
|--|----|--|
| وَ اِذَا نَطَقْتُ فَمَادِحًا عَلَيَّكَ | ৪৪ | فَاِذَا سَكَتُ فَفِيكَ صَمْنِى كُلُّهُ |
|--|----|--|

৪৪. আমি যখন চুপ থাকি, তখন আপনার কথাই চিন্তা করি। আবার যখন কথা বলি, তখন আপনারই প্রশংসা করি।

| | | |
|--|----|--|
| وَ اِذَا نَظَرْتُ فَمَا ۖ اَرَىٰ اِلَّا اَكْ | ৪৫ | وَ اِذَا سَمِعْتُ فَعَنَكَ قَوْ ۖ لَا طَبِيَّا |
|--|----|--|

৪৫. যখন কিছু শুনি, তখন আপনারই কোন উত্তম বাণী শুনি। যখন কিছু দেখি, তখন শুধু আপনাকেই দেখি।

| | | |
|---|----|--|
| وَ اِنِّى فَقِيْرٌ فِى الْوَر ۖ اِى لَغِنَاكَ | ৪৬ | يَا مَالِكِى كُنْ شَافِعِى فِى فَاَتِى |
|---|----|--|

৪৬. হে আমার মালিক! আমার প্রয়োজনকালে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। পৃথিবীতে আমি আপনার ঐশ্বর্যের সবচেয়ে বড় মুখাপেক্ষী।

| | | |
|---|----|--|
| جُدِّى بِجُودِكَ وَ اَرْضْنِى بِرِضَاكَ | ৪৭ | يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَا الْوَر ۖ اِ |
|---|----|--|

৪৭. হে জিন! ইনসানের সবচেয়ে সম্মানিত মহাপুরুষ! হে মাখলুকাতের ধনভাণ্ডার! আমাকে আপনার দানে ধন্য করুন। আপনার সম্ভ্রষ্টি দিয়ে খুশি করুন।

| | | |
|--|----|--|
| لَاِبِى حَيِّفَةً فِى الْاَنَامِ سِوَاكَ | ৪৮ | اَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَ لَمْ يَكُنْ |
|--|----|--|

৪৮. আমি আপনার করুণা প্রত্যাশী। আপনি ছাড়া সারা জাহানে আবু হানীফার আর কেউ নেই।

| | | |
|--|----|--|
| فَلَقَدْ عَدَا مُتَمَسِّكَ ۖ اِبْرَاكَ | ৪৯ | فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيْهِ عِنْدَ حِسَابِهِ |
|--|----|--|

৪৯. বড় আশা হিসাবের কালে আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন। কারণ সেতো আপনারই রশি আকড়ে রয়েছে।

| | | |
|--|----|--|
| فَلْتَسْتَ أَكْرَامُ شَافِعٍ وَمُشَفِّعٍ | ৫০ | وَمَنْ أَلْبَسَ يَ بِحِمَاكَ نَالَ رِضَاكَ |
|--|----|--|

৫০. সবচেয়ে সফল সুপারিশকারী সেতো আপনিই। যে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সে আপনার সম্ভ্রষ্ট লাভ করেছে।

| | | |
|---|----|--|
| فَاجْعَلْ فِرَاكَ شَفَاعَةً لِّي فِي غَدٍ | ৫১ | فَعَسَىٰ أُرَىٰ فِي الْخَشْرِ حَتَّىٰ لَوْ أَكَّ |
|---|----|--|

৫১. আপনার মেহমানদারিকে আমার জন্য আগামীকালের সুপারিশে পরিণত করুন। যাতে হাশরের দিন আমি অপার ঝাণ্ডাতলে শামিল হতে পারি।

| | | |
|---|----|-------------------------------------|
| صَلَّىٰ عَلَيْكَ اللَّهُ يَا عَلَمَ الْهُدَىٰ | ৫২ | مَا حَنَّ مُشْتَاقٌ إِلَىٰ مَثْوَكَ |
|---|----|-------------------------------------|

৫২. হে হিদায়তের প্রতীক! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, যতক্ষণ কোন প্রেমিক আপনার ঠিকানায় প্রত্যাশী থাকে।

| | | |
|---|----|---------------------------------------|
| وَعَلَىٰ صَحَابَتِكَ الْكِرَامِ بِجَمِيعِهِمْ | ৫৩ | وَالتَّابِعِينَ وَكُلَّ مَنْ وَالَاكَ |
|---|----|---------------------------------------|

৫৩. আপনার সম্মানিত সাহাবীগণ, তাঁদের অনুসারীবৃন্দ আর যারা আপনাকে ভালোবেসেছেন সকলের প্রতি হাজারো দরুদ।


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আল-খতীবুল বগদাদী: আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.), তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৩. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি  ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৪. আস-সুয়ুতী

: জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), আল-ফতহুল কবীর ফী যম্মিয় যিয়াদাতি ইলাম জামিয়িস সগীর, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

৫. আল-হাজওয়ীরী

: আবুল হাসান, আবলী ইবনে ওসমান ইবনে আবু আলী আল-জালালী আল-হাজওয়ীরী আল-গযনাওয়ী (০০০-৪৬৫ হি. = ০০০-১০৭২ খ্রি.), কাশফুল মাহজুব, কুতুবখানা শায়খ জান মুহাম্মদ ইলাহী বখশ, লাহোর, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৯ হি. = ১৯৩১ খ্রি.)

৬. আল-হাসকফী : আলাউদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-হিসনী আল-হাসকফী (১০২৫-১০৮৮ হি. = ১৬১৬-১৬৭৭ খ্রি.), *আদ-দুররুল মুখতার তানওয়ীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)
৭. ইবনুন নদীম : আবুল ফারাজ, মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনি মুহাম্মদ ইবনি ইসহাক ইবনি আবী ইয়াকুব আন-নদীম (১০০০-৪৩৮ হি. = ১০০০-১০৪৭ খ্রি.), *আল-ফিহরিস্ত*, দারুল মা'রিফা লিত-তাবা'আ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)
৮. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *তাহযীবুত তাহযীব*, দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নিয়ামিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩২৬ হি. = ১৯০৮ খ্রি.)

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী'র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

রচিত:

০১. প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন
০২. আখিয়া কেরামের ইতিকথা
০৩. ইসলামী জ্ঞানকোষ
০৪. ছাহাবা কেরামের জীবনকথা
০৫. ইতিহাসের দর্শন কাহিনী
০৬. পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ
০৭. ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন?
০৮. কুরআন সূন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান
০৯. কুরআন সূন্নাহর আলোকে রোযার বিধান
১০. কুরআন সূন্নাহর আলোকে পর্দার বিধান
১১. কুরআন সূন্নাহর আলোকে হজ্জ ও ওমরার বিধান
১২. উত্তম কাহিনী
১৩. সহজ ইসলাম শিক্ষা
১৪. আত্মা শাহ আব্দুল জব্বার (রহ.) জীবন ও আদর্শ
১৫. দরুদ শরীফের তাৎপর্য
১৬. ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী
১৭. বড়পীর ছাহেবের নসীহত
১৮. উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা
১৯. কুরআন পরিচিতি ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ
২০. কুরআন মজীদ ও মানবজাতি
২১. ইসলামী আদর্শ
২২. আদর্শ পরিবার ও বিবাহ
২৩. ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা
২৪. আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
২৫. কুরআন ও তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি
২৬. ফিকহ ও আইন শাস্ত্র পরিচিতি
২৭. কুরআন-সূন্নাহর আলোকে আদাব-আখলাক
২৮. কুরআন সূন্নাহর আলোকে নামাযের বিধান
২৯. হাদীস শরীফ ও হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি
৩০. হাদীস শরীফ সিহাহ সিগ্গা পরিচিতি
৩১. হাদীস ফিকহ ইজতিহাদ ও তাকলীদ
৩২. ইমাম আবু হানিফার জীবন ও কর্ম
৩৩. হাদীস শরীফ পরিচিতি
৩৪. মজলিসে আওলিয়া
৩৫. প্রিয় নবীজীর প্রিয় প্রসঙ্গ
৩৬. হযরত কেবলা ও হুজুর কেবলার উপদেশ
৩৭. হাদীস ফিকহ এবং ইমাম আবু হানীফা
৩৮. আহলে বায়ত (প্রকাশের পথে)
৩৯. প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী প্রকাশের পথে
৪০. সুসংবাদ প্রাণ্ড দশ সাহাবী প্রকাশের পথে
৪১. নির্বাচিত হাদীস শরীফ প্রকাশের পথে
৪২. ইবাদত প্রকাশের পথে
৪৩. ইমামুল হাদীস পরিচিতি
৪৪. ইসলামের চারস্তম্ভ প্রকাশের পথে
৪৫. ইতিহাসের জীবন্ত কাহিনী প্রকাশের পথে
৪৬. বিশ্ব বরণ্য আউলিয়ার জীবনকথা প্রকাশের পথে
৪৭. প্রাণী জগতের জীবন কথা
৪৮. চার ইমামের জীবন - ১, ২, ৩, ৪ প্রকাশের পথে
৪৯. চার খলিফার জীবন - ১, ২, ৩, ৪ প্রকাশের পথে
৫০. চার তরীকার ইমামের জীবন - ১, ২, ৩, ৪ প্রকাশের পথে

অনূদিত :

১. আরকানুল ইসলাম (পাঁচ স্তম্ভ)
২. শাযখ ফরিদ উদ্দীন আগার (রাহ.)-এর নসীহত
৩. শেখ সাদীর উপদেশাবলী
৪. পয়গামে মুহাম্মদ (সা.)
৫. নাজাত
৬. সহজ ফিকহ শিক্ষা
৭. জরুরী মাসআলা-মাসায়েল
৮. ঈমানের শাখা-প্রশাখা
৯. হৃদয়ের আলো
১০. সাত মাসআলার সমাধান
১১. আত্মার বাণী
১২. শেখ ফরিদের নসীহত নামা
১৩. কুরআন-সূন্নাহর আলোকে গীবত
১৪. আদেশ ও উপদেশ
১৫. রহমতে আলম
১৬. শেখ সাদীর নসীহত
১৭. উপদেশাবলী
১৮. আল-কুরআন চূড়ান্ত মুজিয়া-আহমদ দিদাত
১৯. আখলাকে মুহাম্মদী (সা.)
২০. আখিয়া কাহিনী
২১. সুফীতত্ত্ব ও সুফিয়ায়ে কেরাম
২২. আল-কাওলুল জামিল
২৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত মুজিয়া
২৪. মহানবীর (সা.) শত মুজিয়া
২৫. মানবজীবনে কুরআনের শিক্ষা
২৬. রাসুলুল্লাহ প্রতি নির্বেদিত কসীদা সমগ্র
২৭. মদীনা শরীফের ঐতিহাসিক স্থান পরিচিতি
২৮. হাদীসের আলোকে মুসলিমদের মর্যাদা
২৯. কুরআন সূন্নাহর আলোকে কবীরী গুনাহ
৩০. ছোটদের নবী রসূল-১
৩১. ছোটদের নবী রসূল-২
৩২. ছোটদের নবী রসূল-৩
৩৩. ছোটদের নবী রসূল-৪
৩৪. কাসীদায়ে নোমান
৩৫. কাসীদায়ে বুরদা
৩৬. কাসীদায়ে গাউসিয়া
৩৭. ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) প্রকাশের পথে
৩৮. ছন্দে ছন্দে মহানবীর নাম মোবারক প্রকাশের পথে
৩৯. কারিমায়ে সাদী
৪০. ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম বুখারী রহ. প্রকাশের পথে
৪১. তাঁলীমে মারফাত- হযরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.)
৪২. নির্বাচিত প্রবন্ধ: বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.)
৪৩. নির্বাচিত ভাষণ: বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.)
৪৪. সর্মপতি শব্দাবলী (কবিতা সংকলন-এক)
৪৫. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক)
৪৬. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই)
৪৭. খুতবাতে পীরে বায়তুশ শরফ
৪৮. মালফুযাতে পীরে বায়তুশ শরফ
৪৯. প্রশ্নোত্তরে ধীন দুনিয়া-১-২-৩
৫০. বায়তুশ শরফের চাঁদ : আবদুল হালীম খাঁ

★ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত

Web : www.saaajbd.org
e-mail : abdulhai.nadvi@yahoo.com



বায়তুশ শরফ কমপ্রেস

শাহ আবদুল জব্বার (রাহঃ) সড়ক
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০